দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 AUG 2016 ...
পৃঃ ... ৬ ... কলাম ... ......

প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

# বার কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

**ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের জন্য বার কাউন্সিলে যে অফেরৎযোগ্য ১০ লক্ষ টাকা জমাদানের কথা বলা হয়েছে, এ টাকা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের পকেট থেকে দেবে না, আইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই টাকা আদায় করবে। এতে অভিভাবকদের ওপর প্রচণ্ড আর্থিক চাপ পড়বে**

সম্প্রতি উচ্চ আদালতের এক রায়ের ফলে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ মোটামুটিভাবে বার কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)-এর এক চিঠিতে তেমন কথাই বলা হয়েছে। দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ইউজিসির যে চিঠি এসেছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে— "বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নিকট হইতে এল,এল,বি (অনার্স) কোর্স খুলিবার নিমিত্তে বাধ্যতামূলকভাবে 'clearance certificate' সংগ্রহ করিবেন অর্থাৎ কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এল,এল,বি (অনার্স) কোর্স খুলিতে হইলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নিকট হইতে পূর্ব অনুমতি সংগ্রহ করিতে হইবে। নতুবা ইউজিসি উক্ত সাবজেক্ট খুলিবার অনুমতি দিতে পারিবে না"। ইউজিসির এই চিঠি থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যাচ্ছে যে, এখন থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করবে বার কাউন্সিল।

উচ্চ আদালতের যে রায়ের ওপর ভিত্তি করে বার কাউন্সিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ লাভ করেছে, সে রায়ের প্রতি একটু দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। দারুল ইহসান নামের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটি মামলার সূত্রপাত ঘটে ২০০৬ সালে। তখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপলব্ধি করতে পারেন— দারুল ইহসান নামের বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের নানা স্থানে শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের মাধ্যমে সার্টিফিকেট বিক্রির কারখানা খুলে ফেলেছে। দারুল ইহসানের সার্টিফিকেট বিক্রির রমরমা ব্যবসা দেখে আরও ক'টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা শুরু করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি দারুল ইহসান সহ বেশ ক'টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। এই পর্যায়ে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দারুল ইহসানের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধের যে নির্দেশ দিয়েছিল, উচ্চ আদালত থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সে নির্দেশকে স্থগিত করে দেয়া হয়। আদালতের রায়কে পুঁজি করে দারুল ইহসান দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের শাখা-প্রশাখা স্থাপনের মাধ্যমে সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা বিপুল উদ্যমে চালাতে থাকে। দারুল ইহসানকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে নর্দান, কুইন্স, এশিয়ান, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিও আদালতের রায়ের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করে। এতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভয়ঙ্কর দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিব্রতবোধ করতে থাকে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কাজ শুরু করে। শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় উপলব্ধি করতে পারেন পুরাতন আইন দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন নতুন একটি আইনের। সেই লক্ষ্যে নতুন আইন তৈরি করা হয় এবং ২০১০ সালে পার্লামেন্টে আইনটি পাশ হয় এবং সে আইনের নামকরণ হয় 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০'।

দারুল ইহসান এবং সর্টিফিকেট ব্যবসাধারী অন্য ক'টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ২০১০-আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে আবারও সমস্যার সম্মুখীন হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে দারুল ইহসান পুনরায় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় দেশবাসীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন ২০১০-আইনের পরিপ্রেক্ষিতে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধ, তবে দেশের উচ্চ আদালত যদি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যায়ের পক্ষে রায় প্রদান করেন, সে ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু করার থাকে না। তবে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। ২০১০-আইন প্রয়োগের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ২০০৬ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে মোট ১৩টি রিট পিটিশন হাইকোর্টে দায়ের করা হয়। শেষ পর্যন্ত সকল মামলা একটি বেঞ্চে এনে শুনানীর ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৬ সালের ১ মার্চ থেকে বিভিন্ন কর্মদিবসে শুনানী শেষে ১৩ এপ্রিল মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি মো. রেজাউল হক এবং বিচারপতি মুহম্মদ খুরশিদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ।

১২৬ পৃষ্ঠার রায়ের কপিতে মূল আদেশসহ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ইউজিসি, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের জন্য আলাদা নির্দেশনা ও আদেশ প্রদান করা হয়। দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি সম্পর্কিত রায়ে বলা হয়েছে, 'দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি আইনের চোখে ইউনিভার্সিটি নয়'। আদালতের বর্তমান এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তাহলে ২০০৬ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারলো কিভাবে?— এ রহস্য আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৬ সাল থেকে বলে আসছে দারুল ইহসান একটি অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে একমত হতে আদালতের সময় লেগেছে দীর্ঘ ১০ বছর। আদালতের এই সময় ক্ষেপনের ফলে দেশ, জাতি ও শিক্ষার্থীদের মহা ক্ষতি হয়ে গেছে। এ ক্ষতি কখনও পূরণ হবার নয়। আদালত সময় মত সিদ্ধান্ত দিলে এ ক্ষতির হাত থেকে জাতি রক্ষা পেত।

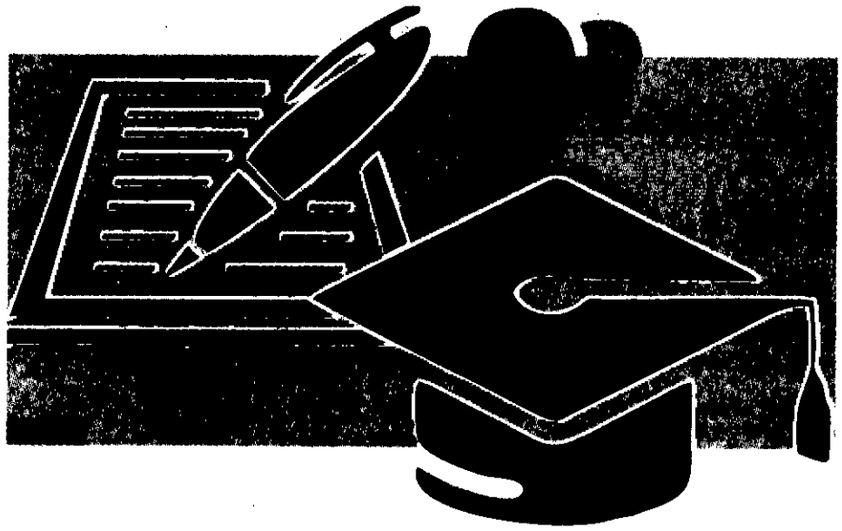



আদালতের যাঁরা বিচারপতি তাঁরা সবাই এক সময় আইনের ছাত্র ছিলেন, যে কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার মান নিয়ে তাঁরা যতটা চিন্তা-ভাবনা করেছেন, অন্য কোনো বিভাগের শিক্ষার মান নিয়ে তেমনটি করেননি। রায়ের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে বার কাউন্সিল এবং আইন বিভাগের শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত। এ রায়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু আইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বার কাউন্সিলকে। এ ক্ষেত্রে ইউজিসি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন রকম ভূমিকা থাকবে না। ইউজিসির প্রতি আদালতের নির্দেশনা এ রকম— "বার কাউন্সিলের কাছ থেকে আগেভাগে 'ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট' না নিলে কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে এলএলবি (অনার্স) কোর্সের অনুমোদন দেয়া যাবে না। এ আদেশ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নেয়ার জন্য ইউজিসি সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে নোটিস জারি করবে।"

আদালত বার কাউন্সিলের প্রতি নির্দেশনায় উল্লেখ করেছেন— "ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা বার কাউন্সিল তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।" ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের জন্য কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যখন আবেদন করবে, তখন আবেদনপত্রের সাথে বার কাউন্সিলের ব্যাংক হিসাবে অফেরৎযোগ্য ১০ লক্ষ টাকা জমা দিতে হবে। রায়ে বলা হয়েছে "ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর আগে বার কাউন্সিল সুপ্রিম কোর্টের দু'জন মাননীয় বিচারপতিকে সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটি দেখার অনুরোধ করবে। যদি মাননীয় বিচারপতিগণ ইতিবাচক প্রতিবেদন দাখিল করেন তাহলে বার কাউন্সিল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করবে।"

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৯৭টি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। দু'জন বিচারককে যদি ৯৭টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হয়, তিনি আদালতে বসবেন কখন? সমস্ত বছর ধরে তাঁদের দু'জনকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতেই ব্যস্ত থাকতে হবে। এতে আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটবে।

ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের জন্য বার কাউন্সিলে যে অফেরৎযোগ্য ১০ লক্ষ টাকা জমাদানের কথা বলা হয়েছে, এ টাকা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের পকেট থেকে দেবে না, আইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই টাকা আদায় করবে। এতে অভিভাবকদের ওপর প্রচণ্ড আর্থিক চাপ পড়বে। এটাই বাস্তবতা। এতে আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা একটি বাড়তি চাপের মধ্যে পড়ে গেল।

আদালতের রায় থেকে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে বার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে। আইন বিভাগে আবেদনকারীকে এইসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৭০ শতাংশ নম্বর ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হতে হবে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বার কাউন্সিল ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করবে। আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের অ্যাডভোকেটশিপ পরীক্ষার মত লিখিত ও এমসিকিউ পরীক্ষাও নেবে বার কাউন্সিল।

রায়টি বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের বাস্তবতা এ রকম— শিক্ষার্থীরা প্রথমে ভর্তি হতে চাইবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না, তারা ভর্তি হতে চাইবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও যারা ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করবে না, তারা ভর্তি হতে আসবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাজেই আদালত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যাশা করছে, বাস্তবে তা মিলবে না। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পাবলিক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কঠিন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাবী ছেলেমেয়েরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হবে এটাই স্বাভাবিক। এর বাইরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে যারা ভর্তি হতে চাইবে তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জিপিএ-৫ থাকবে। ইংরেজিতে ৭০% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী আদৌ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। এই রায়ের শর্ত পূরণ করতে পারবে তেমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হবে অতি নগণ্য। কাজেই বার কাউন্সিলকে সম্ভবত পুনরায় আদালতের কাছে ভর্তির শর্ত শিথিল করার আবেদন জানাতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় প্রায়ই বলে থাকেন সরকার প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনরকম বৈষম্য বা পার্থক্য রাখতে চায় না। দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য আদালত থেকে যে রায় দেয়া হয়েছে, সে রায়ের ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। কারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো শর্ত দেওয়া হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত অনাচার ও অনিয়ম হয়েছে তার মূলে রয়েছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার প্রতিরোধে কম চেষ্টা করে নি। ২০০৬ সাল থেকে বিশেষ করে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' পাশ হবার পর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়ে আসছে- তাদের দৃষ্টিতে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান অবৈধ। কিন্তু আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। তবে আনন্দের বিষয়, এতদিনে উচ্চ আদালত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন। এই রায়ের ফলে আশা করা যায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান উন্নত হবে। কিন্তু বার কাউন্সিল যেভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে তাতে আইন বিষয়ক শিক্ষার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

● লেখক : সাবেক ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়